বাংলা উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি, মানুষ ও সমাজ

ভূমিকা

উত্তরবঙ্গ এক বিরাট ভৌগোলিক ব্যাপ্তি। পাঁচটি জেলা বিভক্ত হয়ে বর্তমানে ছয়টি। আরো একটি নতুন জেলা সৃষ্টি হলো সম্প্রতি। এই বিশাল আঞ্চলিক পটভূমিতে নানান বৈচিত্র্য। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদহ - বিশাল ভূখন্ডই উত্তরবঙ্গ নামে আখ্যায়িত। এখানকার ভু-প্রকৃতি, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জলবায়ু নিজস্ব স্বাতন্ত্রে ভরপুর। উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক সম্পদ অনুভবী মানুষকে আকৃষ্ট করেছে বারবার। দিগন্তে আঁকা পর্বতশ্রেণি, উঁচুনিচু পাহাড়, স্রোতস্বিনী পাহাড়ি নদী, ঢেউখেলানো চা-বাগিচা, ঘন রহস্যময় বনজঙ্গল, সবুজ নির্মল ফসলের ক্ষেত সৃজনশীল মানুষকে মোহিত করে। ডুয়ার্স ও তরাইয়ের আদিম বনভূমি ও চা-বাগানের মাঝখানে নানান উপজাতি জনগোষ্ঠির স্বতন্ত্রজীবনধারা। রেলপথনির্মাণ ও চা-বাগানকে কেন্দ্র করে ছোটনাগপুর, রাঁচী, দুমকা, হাজারিবাগ, চাইবাসা, কেওনঝর, মধ্যপ্রদেশের বস্তার প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রচুর আদিবাসী মানুষজন উত্তরবঙ্গে কাজের জন্যে এসে এখানকার পাকাপাকি বাসিন্দা হয়ে যান। এসেছেন বাংলাদেশ থেকে প্রচুর উদ্বাস্তু মানুষজন। রয়েছে এখানকার আদি বাসিন্দারাও। রাজবংশী, মেচ, সাঁওতাল, মুন্ডা, রাভা, মালপাহাড়ী, ওঁরাও, খেড়িয়া, শবর, লেপচা, বোড়ো, টোটো, নেপালী, লেপচা, ভুটানী ইত্যাদি বহু জনজাতি মিলেমিশে এখানে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সুন্দর পরিবেশ তৈরি করেছে। ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, খাদ্যাভ্যাস, জীবিকা ইত্যাদি সবকিছুতেই অনন্য বিচিত্রতা। বৈচিত্র্যময় জীবনজীবিকার পাশাপাশি রয়েছে জীবনসংগ্রামের ঘাতপ্রতিঘাত। দারিদ্রের সঙ্গে কঠোর লড়াইকে আরো সঙ্কটময় করে তুলেছে একের পর এক বন্ধ চা-বাগান। সঙ্গে রাজনৈতিক চিন্তাচেতনার সংঘাত ও দ্বন্দ্ব।

স্বাভাবিকভাবে এই বিচিত্রতা সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে খুবই অনুকূল। তা এনে দেয় প্রচুর সাহিত্য উপাদান। সাহিত্যিকেরা এই ভূখন্ড ও তার মানুষদের দিকে তাঁদের সৃজনশীল দৃষ্টি ফেরাবেন না তা হতে পারে না। উত্তরবঙ্গের মোহময় নিসর্গ-প্রকৃতি নিয়ে অনেক কবি কাব্য সৃষ্টি করেছেন। যেমন একটি

কবিতা উদ্ধৃত করা যেতে পারে দৃষ্টান্তস্বরূপ ঃ

এখন আমি খুট্টিমারির গাঢ় জঙ্গলে বসে তপমগ্নতায় আচ্ছন্ন, জ্যোৎস্না রাভার গান
ঝুলে আছে বিশাল শাল সেগুনের কম্পিত পাতায়, যেন দশ বছর আগের শোনা
রাভাসঙ্গীত এখন হয়ে উঠেছে আরণ্যক ক্যানভাস। বাতাসের জলছবি গোপন নদীতে
মাছরাঙা ডাহুক বা পানকৌড়ি এখনো এখানে সাঁতার কাটে, কারণ এখানে বাজে না
মোবাইলের রিং-টোন, ইথারতরঙ্গে বয়ে আসে না নগ্ন বলিউড অনাবৃত বুক বা নিদম্ব
এখানে তপস্বী হই - হাতে ধরা অদৃশ্য কমন্ডুলু, সেখানে শুদ্ধ জল বিশুদ্ধ বাতাস।

এখন আমি মধুবনীর তীর ধরে যেতে যেতে নিরুদ্দেশের মন্ত্র আওড়াচ্ছি একা একা
তিরতিরে জল শুনিয়ে চলেছে জলকাব্য, যেন অদৃশ্য দোতারায় জলময় টুংটাং
জল-খমকের আচ্ছন্ন দমক মাঝে মাঝে বুকের ভেতরে এঁকে দিচ্ছে তীব্র আনচান
সরাজের তার কার আঙুলের কারসাজিতে কারুকাজ আঁকছে প্রবহমান জলধারায়
এক ঝাঁক সাদা বক অনেক আঁকবাঁক পেরিয়ে এখানে পৌঁছে নীরবতা পালন করছে
সেই শোকসভায় আসন পেতে বসি, নীরবতার শব্দ উচ্চারণ করতে করতে শোকাচ্ছন্ন হই।

এখন আমি কালাপানির গভীরে বিলুপ্ত খয়েরদের জন্য দীর্ঘ এলিজি লিখবো বলে
নাথুয়ার বন্ধুদের ডাকে সাড়া দিলাম না, ধূমপাড়ার ইশারাকে অস্বীকার করলাম নির্দ্বিধায়
তারপর আল পথে কিছু ঘাস চেনা অচেনা রোদ অবাক বিস্মিত ঘাসফুল বিশ্রামরত ফড়িং
আর অনাবিল কিশোরী হাওয়ার সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম এক যুগ আগে দেখা বনের দিকে
মৃতপ্রায় নদীর হৃদপিন্ডে কান পাতলাম, ঠোঁট ছোঁয়ালাম মোষের পায়ের ছাপ আঁকা মাটিতে
প্রগাঢ় কান্না উগড়ে এলো মাটির অভ্যন্তর থেকে, ঝাপসা চোখে লিখতে লাগলাম শোককাব্য।

এখন আমি কঠিন শব্দ হাতড়ে বেড়াই না, তিস্তার মতো কষ্টে অথচ তীব্র আনন্দে সহজিয়া
ব্যাকরণের চর্চ্চা করি, ভ্রুকুটিবিভঙ্গে আমার কিছু যায় আসে না - কারণ ডুয়ার্সের অলিগলি
আমার কাছে মেলে দেয় অনন্ত শব্দরূপ । পাখিদের কাছে শিখে নিই অপিনিহিতির আনন্দ
পাহাড়ী নদী উপহার দেয় বাগধারার বিপুল সম্ভার, বাতাসের অভিন্ন ভাষা আমাকে জানায়
ভাষা-উপভাষার দ্বন্দ্বের অনেক উপরে ভালোবাসা। প্রতি দিন ভালোবাসতে ভালোবাসতে তাই
হেঁটে যাই ডুবে যাই ভেসে যাই আরো সবুজে আরো নীলে প্রগাঢ় ভোর থেকে নিস্তব্ধ রাত্রে।[১]

কথাসাহিত্যেও উত্তরবঙ্গ তার জায়গা করে নিয়েছে। এই গবেষণাপত্রে কথাসাহিত্যের অন্যতম শাখা উপন্যাসে উত্তরবঙ্গ কীভাবে কতটা জায়গা করে নিয়েছে তা নিয়ে আলোকপাত করা হবে।

তার আগে আলোচনার সুবিধের জন্য উত্তরবঙ্গ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত প্রয়োজন।

'পুণ্যতোয়া গঙ্গা আমাদের পশ্চিমবঙ্গকে আড়াআড়িভাবে দুটো ভাগে ভাগ

করেছে। পশ্চিমবঙ্গের ১৯টি জেলার মধ্যে ১৩টি জেলা নিয়ে গঙ্গা নদীর ডানদিকে গঠিত হয়েছে দক্ষিণবঙ্গ। আর বাকি ছয় জেলা নিয়ে গঙ্গা নদীর বাম দিকে গঠিত হয়েছে উত্তরবঙ্গ। প্রশাসনিকভাবে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ নামে কোনও বিভাজন না থাকলেও ভৌগোলিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে অবস্থিত মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলা নিয়ে গঠিত বিস্তীর্ণ ভূভাগ লোকমুখে উত্তরবঙ্গ নামে পরিচিত।

'উত্তরবঙ্গের উত্তরে সিকিম ও ভুটান, পশ্চিমে বিহার ও নেপাল, পূর্বে আসাম ও বাংলাদেশ এবং দক্ষিণে গঙ্গানদী ও মুর্শিদাবাদ জেলা অবস্থিত।

উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলার মোট ক্ষেত্রফল হল ঃ

১. কোচবিহার জেলা ঃ ৩৩৮৭ বর্গ কিমি
২. জলপাইগুড়ি ঃ ৬২২৭ বর্গ কিমি
৩. দার্জিলিং ঃ ৩১৪৯ বর্গ কিমি
৪. উত্তর দিনাজপুর ঃ ৩১৩৯ বর্গ কিমি
৫. দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ ২২১৯ বর্গ কিমি
৬. মালদহ ঃ ৩৭৩৩ বর্গ কিমি

মোট ঃ ২১৮৫৪ বর্গ কিমি

উত্তরবঙ্গ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের আয়তনের প্রায় ২৪.৮৮ শতাংশ বা এক-চতুর্থাংশ।

উত্তরবঙ্গের ৬ জেলার মোট জনসংখ্যা হল ঃ

১. কোচবিহার জেলা ঃ ২৪,৭৮,২৮০ জন
২. জলপাইগুড়ি ঃ ৩৪,০৩,২০৪ জন
৩. দার্জিলিং ঃ ১৬,০৫,৯০০ জন
৪. উত্তর দিনাজপুর ঃ ২৪,৪১,৮২৪ জন
৫. দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ ১৫,০২,৬৪৭ জন
৬. মালদহ ঃ ৩২,৯০,১৬০ জন

মোট ঃ ১৪,৭২২,০১৫ জন

পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা ৮০২২১১৭৯ জন। উত্তরবঙ্গের মোট জনসংখ্যা

১৪৭২২০১৫ জন। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের ১৮.৩৫ শতাংশ মানুষ উত্তরবঙ্গে বাস করেন।[২]

'উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থানই এর ভৌগোলিক গুরুত্ব বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। দেশভাগের পর উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। সমগ্র উত্তরপূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার হল উত্তরবঙ্গের অঘোষিত রাজধানী শিলিগুড়ি। সমগ্র উত্তরপূর্ব তো বটেই প্রতিবেশী রাজ্য সিকিম এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভুটানে প্রবেশ করতে হবে উত্তরবঙ্গের মধ্য দিয়েই। সিকিমের নাথুলাপাসের মধ্য দিয়ে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য শুরু হওয়ায় উত্তরবঙ্গের গুরুত্ব আরো বেড়েছে। উত্তরবঙ্গের তিনপাশে আন্তর্জাতিক সীমানা এবং তিনটি রাজ্য সীমানা এবং খুবই কাছে ম্যাকমোহন লাইন অবস্থান করায় ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের গুরুত্ব অসীম।

'সমগ্র উত্তরবঙ্গের জলবায়ু ক্রান্তিয় মৌসুমী প্রকৃতির হলেও দক্ষিণ থেকে উত্তরে জলবায়ু বৈচিত্র্যে ভরা। দক্ষিণে মালদহ অনেকটাই কর্কটক্রান্তি রেখার কাছে অবস্থিত হওয়ায় গ্রীষ্মে গরমের তীব্রতা অনেকটাই বেশি। সে তুলনায় উত্তরে অবস্থিত কোচবিহার, জলপাইগুড়ি-তে গরমের তীব্রতা অনেকটাই কম। দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চল হওয়ায় গ্রীষ্মকালে পশ্চিমবঙ্গের শীতকালের জলবায়ু বিরাজ করে আর শীতকালে বরফ পড়ে। অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের উত্তর থেকে দক্ষিণে গ্রীষ্মের দাবদাহ বাড়তে থাকে। ... উত্তরবঙ্গের গড় বৃষ্টিপাত ৩০০ সেমি। উত্তরের দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চল, তরাই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি। ... গ্রীষ্মে কালবৈশাখী ঝড় এবং শরতে আশ্বিনের ঝড় এখানকার জলবায়ুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বঙ্গদেশে ছয়টি ঋতু থাকলেও উত্তরবঙ্গে প্রধানত চারটি ঋতু ঃ গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও শীত ঋতু অনুভূত হয়।

'উত্তরবঙ্গের ভূ-প্রকৃতি বৈচিত্র্যে ভরা। এখানকার ভূ-প্রকৃতিকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ ১. পার্বত্য অঞ্চল ২. তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চল ও ৩. সমভূমি অঞ্চল। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে গঠিত। এটি হিমালয়ের অংশ। ঢেউ-খেলানো বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি, গিরিখাত, খাড়া ঢাল এখানকার প্রধান বৈশিষ্ট্য। পাললিক ও রূপান্তরিত শিলায় গঠিত অঞ্চলটি। পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সান্দাকফু (৩৬৩০ মি.) এখানেই অবস্থিত। এছাড়া উল্লেখযোগ্য শৃঙ্গ হল টাইগার হিল। - উত্তরবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলের দক্ষিণে অর্থাৎ দার্জিলিং

জেলার শিলিগুড়ি মহকুমা ও জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরপূর্বাংশ নদীবাহিত বালি আর নুড়ি জমে সৃষ্টি হয়েছে তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চল। এটি উত্তর থেকে দক্ষিণে ঢালু। তিস্তা নদী এই অঞ্চলটিকে দুটি ভাগে ভাগ করেছে। তিস্তা ডানদিকের অংশ তরাই এবং বাঁদিকের অংশ ডুয়ার্স নামে পরিচিত। এই অঞ্চলটি আর্দ্র ও স্যাঁতস্যাতে। অঞ্চলটি প্রায় সমতল। তবে এখানে সেখানে উঁচু জমি এবং ছোট ছোট পাহাড় চোখে পড়ে। চেঙ্গমারী, লংকাপাড়াহাট, জয়ন্তী প্রভৃতি অঞ্চলে ভুটানের ডুয়ার্স পর্বতমালার অংশবিশেষ দেখা যায়। - তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের দক্ষিণ থেকে গঙ্গা নদী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ জলপাইগুড়ি জেলার দক্ষিণাংশ কোচবিহার দুই দিনাজপুর ও মালদহ জেলা নিয়ে গঠিত উত্তরবঙ্গের সমভূমি অঞ্চল। তিস্তা, তোর্সা, মহানন্দা প্রভৃতি নদীর পলি জমে এই অঞ্চলটি গড়ে উঠেছে। সমতল হলেও মাঝে মাঝে এখানে সেখানে খালবিল ও উঁচুনিচু জমি চোখে পড়ে।

উত্তরবঙ্গে স্থানভেদে মৃত্তিকার পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। - উত্তরবঙ্গ নদীমাতৃক। অসংখ্য নদনদী উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।এখানকার নদীগুলির মধ্যে তিস্তা, তোর্সা, সংকোশ, কালজানি, জলঢাকা, রায়ডাক, মেচি, বালাসন, মহানন্দা, পুনর্ভবা, টাঙ্গন প্রধান। বেশির ভাগ নদী হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল থেকে সৃষ্টি উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের মধ্যে গিয়ে ব্রহ্মপুত্রে মিশেছে। টাঙ্গন ও মহানন্দা মালদার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পদ্মায় মিশেছে। প্রায় সব নদীই বরফগলা জলে পুষ্ট বলে সারা বছর জল থাকে। পার্বত্য অঞ্চলে খরস্রোতা, তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলে বর্ষাকালে বন্যার সৃষ্টি করে। প্রায় প্রতি বছরই নদীগুলি উত্তরবঙ্গে বন্যার সৃষ্টি করে, ফলে অধিবাসীদের দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নদী উত্তরবঙ্গের এই অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশকে যেমন নিয়ন্ত্রণ করে তেমনি এখানকার জনজীবনে অর্থনীতি, সমাজজীবন, সংস্কৃতি প্রভৃতিকেও যুগ যুগ ধরে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে।

'উত্তরবঙ্গ বনভূমিতে আবৃত। এখানে প্রধান ক্রান্তিয় আর্দ্র পর্ণমোচী ও ক্রান্তিয় শুষ্ক পর্ণমোচী অরণ্যের বৃক্ষ দেখা গেলেও দার্জিলিং-এর উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন উচ্চতায় শাল, শিমুল, কদম প্রভৃতি গাছ জন্মে। ১০০০-২০০০ মি. উচ্চতায় ওক, ম্যাগনোলিয়া, লরেল, রডোডেনড্রন প্রভৃতি গাছ জন্মে। - তরাই অঞ্চলে শাল, সেগুন, তুন, চম্পা প্রভৃতি বৃক্ষের গভীর বনভূমি সৃষ্টি হয়েছে। তরাইয়ের বনভূমিতে হাতি, গন্ডার, নেকড়ে, বাঘ, বনবিড়াল প্রভৃতি জীবজন্তু বাস করে। তরাইয়ের গরুমারা, চাপড়ামারি, সংরক্ষিত বনভূমি ও জলদাপাড়া

অভয়ারণ্যের সৃষ্টি করা হয়েছে। জলদাপাড়া একশৃঙ্গ গন্ডারের জন্য বিখ্যাত।
'সমভূমি অঞ্চলে বনভূমির পরিমাণ খুবই কম। আগে বনভূমিতে ঢাকা থাকলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বন কেটে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করা হয়েছে। তবে এই সমভূমির সর্বত্রই আম, জাম, কাঁঠাল, বট, অশ্বত্থ ইত্যাদি গাছ জন্মে।
'উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জনজাতির বাস। ... উত্তরবঙ্গের জনজাতিকে তিনভাগে ভাগ করা যায় ঃ
১. আদি জনজাতি, যেমন - মেচ, রাভা, গারো, টোটো, লেপচা, ভুটিয়া প্রভৃতি। এরা মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর।
২. বহিরাগত জনজাতি, যেমন - সাঁতাল, কোল, ভীল, মুন্ডা, ওঁরাও, খাসিয়া প্রভৃতি। এরা অষ্ট্রিক/দ্রাবিড়/কোল গোষ্ঠীর।
৩. অধুনাবিলুপ্ত বা স্থানান্তরিত জনজাতি, যেমন - পানিকোচ, ধীমাল, চেয়ো, ধামি, ডয়া, তন্ত, কিচক, মালদা প্রভৃতি। এরা মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর।
উত্তরবঙ্গে মোট জনসংখ্যার হিসেবে সবচেয়ে বেশি বাস রাজবংশীদের।'[৩]
প্রতিটি জনজাতির নিজস্ব লোকসংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রয়েছে।
'উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক পরিবেশ এখানকার জনজাতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। এখানকার জনজাতিসমূহের শিক্ষা, সাহিত্য, সভ্যতা, আচার-আচরণ ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত। এই অঞ্চলের বেশির ভাগ জনজাতি সহজ সরল জীবনযাপন করে।
পাহাড়, বনজঙ্গল, নদ-নদী ঘেরা উত্তরবঙ্গের জনজাতির লোকেরা গাছ, পাথর, নদী প্রভৃতির পূজাও যেমন করে তেমনি পূজা করেন অন্যান্য দেবদেবীর।
উত্তরবঙ্গের জনজাতিসমূহ দীর্ঘদিন ধরে পাশাপাশি বসবাস করার ফলে একে অপরের জীবনযাপন সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করার ফলে এক মিশ্র সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন জনজাতি সমূহের ভাষা, সংস্কৃতি আলাদা, তাদের আগমন ঘটেছে বিভিন্ন স্থান থেকে, কোন জনগোষ্ঠী তিব্বত থেকে, কোন জনগোষ্ঠী মেঘালয় থেকে, কোন জনগোষ্ঠী ভুটান থেকে, ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে, আবার কোন জনগোষ্ঠী বাংলাদেশ থেকে এসেছে। পারস্পরিক লেনদেনের ফলে গড়ে উঠেছে মিশ্র সংস্কৃতি।[৪]
উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের এই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে আমরা দেখতে পাই। উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদ যেমন কথাসাহিত্যে প্রাধান্য পেয়েছে, তেমনি নানান জনগোষ্ঠীর মানুষজনকে আমরা উত্তরবঙ্গকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলোতে দেখতে

পাই। সমরেশ মজুমদারের উপন্যাসে চা-বাগান ও পাহাড়ের মানুষজন, দেবেশ রায়ের উপন্যাসে রাজবংশী মানুষজন, অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাসে রাভা সহ অন্যান্য জনজাতির কথা আমরা পাই। পরবর্তীতে তা বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

বাংলা উপন্যাসের জনক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর আনন্দমঠ উপন্যাসে যে অরণ্যের বর্ণনা পাওয়া যায় তার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের অরণ্যের সাদৃশ্য অনেকটাই ঃ

> 'অতি বিস্তৃত অরণ্য। অরণ্যমধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল, কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও অনেকজাতীয় গাছ আছে। গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া অনন্ত শ্রেণী চলিয়াছে। বিচ্ছেদশূন্য ছিদ্রশূন্য আলোকপ্রবেশের পথমাত্রশূন্য; এইরূপ পল্লবের অনন্ত সমুদ্র, ক্রোশের পর ক্রোশ, ক্রোশের পর ক্রোশ, পবনে তরঙ্গের উপরে তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিয়াছে। নীচে ঘনান্ধকার। মধ্যাহ্নেও আলোক অস্ফুট, ভয়ানক। তাহার ভিতরে কখন মনুষ্য যায় না। পাতার অনন্ত মর্মর এবং বন্য পশুপক্ষীর রব ভিন্ন অন্য শব্দ তাহার ভিতর শুনা যায় না।
>
> একে এই বিস্তৃত অতি নিবিড় অন্ধ তমোময় অরণ্য; তাহাতে রাত্রিকাল। রাত্রি দ্বিতীয়প্রহর। রাত্রি অতিশয় অন্ধকার; কাননের বাহিরেও অন্ধকার; কিছু দেখা যায় না। কাননের ভিতরে তমোরাশি ভূগর্ভস্থ অন্ধকারের ন্যায়।
>
> 'পশুপক্ষী একেবারে নিস্তব্ধ। কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সেই অরণ্যমধ্যে বাস করে। কেহ কোন শব্দ করিতেছে না। বরং সে অন্ধকার অনুভব করা যায় - শব্দময়ী পৃথিবীর সে নিস্তব্ধভাব অনুভব করা যাইতে পারে না।
>
> 'সেই অন্তশূন্য অরণ্যমধ্যে, সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে, অননুভবনীয় নিঃস্তব্ধ মধ্যে শব্দ হইল-আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে ?'[৫]

উল্লেখ্য সন্ন্যাসী বিদ্রোহ উত্তরবঙ্গেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

'সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পরিধি ছিল বহুদূর বিস্তৃত। বিদ্রোহী সন্ন্যাসী ও ফকিররা জমিহারা কৃষক ও বেকার কারিগর, সৈন্যদের সহজেই দলে টানতে পেরেছিল। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ক্ষেত্র ছিল ব্যাপক। শ্রীহট্ট জেলা থেকে আরম্ভ করে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের অনেকগুলি জেলা ও গঙ্গার পশ্চিমে যশোর খুলনা ও মুর্শিদাবাদ জেলা হয়ে বীরভূম পর্যন্ত এবং বিহারের সারন ও চম্পারণ জেলা পর্যন্ত। বিদ্রোহের নেতা ছিলেন মজনু ফকির বা মজনু শাহ। তারপর পর তাঁর ভাই মুশা

শাহ। ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণী ইত্যাদি অনেক পর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[৬]

বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের অনেকটা জুড়ে বৈকণ্ঠপুর জঙ্গল। বৈকণ্ঠপুর আসলে জলপাইগুড়ির আগের নাম। এই বৈকণ্ঠপুরের জঙ্গলে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের যোদ্ধারা আস্তানা গাড়েন।

যে নদী দিয়ে দেবী চৌধুরাণীর নৌকো যায়, সেটি আসলে তিস্তা; তখন তার নাম ত্রিস্রোতা। তেমনি এক নৌকো যাত্রার বর্ণনা ঃ

> 'বর্ষাকাল। রাত্রি জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না এমন বড় উজ্জ্বল নয়, বড় মধুর একটু অন্ধকারমাখা - পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মতো। ত্রিস্রোতা নদী বর্ষাকালের জলপ্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদীজলের স্রোতের উপর-স্রোতে, আবর্তে, কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে জ্বলিতেছে। কোথাও জল একটু ফুটিয়া উঠিতেছে - সেখানে একটু চিকিমিকি; কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ হইতেছে, সেখানে একটু ঝিকিমিকি। তীরে, গাছের গোড়ায় জল আসিয়া লাগিয়াছে - গাছের ছায়া পড়িয়া সেখানে জল বড় অন্ধকার; অন্ধকারে গাছের ফুল, ফল, পাতা বাহিয়া তীব্র স্রোত চলিতেছে; তীরে ঠেকিয়া জল একটু তর-তর কল-কল পত-পত শব্দ করিতেছে - কিন্তু সে আঁধারে আঁধারে। আঁধারে, আঁধারে, সে বিশাল জলধারা সমুদ্রানুসন্ধানে পক্ষিনীর বেগে ছুটিয়াছে। কূলে কূলে অসংখ্য কল-কল শব্দ, আবর্ত্তের ঘোর গর্জন; সর্ব্বশুদ্ধ একটা গম্ভীর গগনব্যাপি শব্দ উঠিতেছে।
>
> 'সেই ত্রিস্রোতার উপরে, কূলের অনতিদূরে একখানি বজরা বাঁধা আছে। বজরার অনতিদূরে একটা বড় তেঁতুলগাছের ছায়ায় , অন্ধকারে আর একখানি নৌকা আছে-।'[৭]

পরবর্তী যে সমস্ত ঔপন্যাসিকের লেখায় উত্তরবঙ্গ এসেছে তাদের মধ্যেও তিস্তার বিস্তর বর্ণনা আমরা পেয়েছি। এর সূচনা হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রেই।

সন্ন্যাসীদের সভা বা দরবার হয় এই বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলেই। ইংরেজরা তন্ন তন্ন করে সন্ন্যাসীদের খুঁজছে। পাঁচশো সিপাহী নিয়ে দেবী চৌধুরাণীর খোঁজে আসছে। তাই ভবানী পাঠক নির্দেশ দেন ঃ

> 'বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে দরবার হইবে, প্রচার করিয়াছি। সোমবার দিন অবধারিত করিয়াছি। সে জঙ্গলে সিপাহী যাইতে সাহস করিবে না - করিলে মারা পড়িবে। ইচ্ছামতো টাকা লইয়া আজি বৈকণ্ঠপুরের জঙ্গলে যাত্রা কর।'[৮]

বৈকণ্ঠপুরের জঙ্গলে দেবী চৌধুরাণীর দরবারের খুব সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় ঃ

'সোমবারে প্রাতঃসূর্য্যপ্রভাসিত নিবিড় কাননাভ্যন্তরে দেবী রাণীর দরবার বা এজলাস্। সে এজলাসে কোন মোকদ্দমা-মামলা হইত না। রাজকার্য্যের মধ্যে কেবল একটা কাজ হইত - অকাতরে দান।

'নিবিড় জঙ্গল - কিন্তু তাহার ভিতর প্রায় তিন শত বিঘা জমি সাফ হইয়াছে। সাফ হইয়াছে, কিন্তু বড় বড় গাছ কাটা হয় নাই - তাহার ছায়ায় লোক দাঁড়াইবে। সেই পরিষ্কার ভূমিখন্ডে প্রায় দশ হাজার লোক জমিয়াছে - তাহারই মাঝখানে দেবী রাণীর এজলাস্। একটা বড় সামিয়ানা গাছের ডালে ডালে বাঁধিয়া টাঙ্গান হইয়াছে। তার নীচে বড় বড় মোটা মোটা রূপার ডান্ডার উপর একখানা কিংখাপের চাঁদওয়া টাঙ্গান - তাতে মতির ঝালর। তাহার ভিতর চন্দনকাষ্ঠের বেদী। বেদীর উপর বড় পুরু গালিচা পাতা। গালিচার উপর একখানা ছোট রকম রূপার সিংহাসন। সিংহাসনের উপর মসনদ পাতা - তাহাতেও মুক্তার ঝালর। দেবীর বেশভূষার আজ বিশেষ জাঁক। শাড়ি পরা। শাড়িখানায় ফুলের মাঝে মাঝে এক একখানা হীরা। অঙ্গ রত্নে খচিত - কদাচিৎ মধ্যে মধ্যে অঙ্গের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেখা যাইতেছে। গলায় এত মতির হার যে, বুকের আর বস্ত্র পর্যন্ত দেখা যায় না। মাথায় রত্নময় মুকুট। দেবী আজ শরৎকালে প্রকৃত দেবীপ্রতিমা মত সাজিয়াছে। এ সব দেবীর রাণীগিরি। দুই পাশে চারি জন সুসজ্জিতা যুবতী স্বর্ণদন্ড চামর লইয়া বাতাস দিতেছে। পাশে ও সম্মুখে বহুসংখ্যক চোপদার ও আশাবরদার বড় জাঁকের পোশাক করিয়া, বড় বড় রূপার আশা ঘাড়ে করিয়া খাড়া হইয়াছে। সকলের উপর জাঁক বরকন্দাজের সারি। প্রায় পাঁচ শত বরকন্দাজ দেবীর সিংহাসনের দুই পাশে সার দিয়া দাঁড়াইল। সকলেই সুসজ্জিত - লাল পাগড়ি, লাল আঙ্গরাখা, লাল ধুতি মালকোচা মারা, পায়ে লাল নাগরা, হাতে ঢাল-সড়কি। চারিদিকে লাল নিশান পোঁতা।

'দেবী সিংহাসনে আসীন হইল। সেই দশ হাজার লোকে একবার 'দেবী রাণী কি জল' বলিয়া জয়ধ্বনি করিল। তারপরে দশ জন সুসজ্জিত যুবা অগ্রসর হইয়া মধুর কন্ঠে দেবীর স্তুতিগান করিল। তারপর সেই দশ সহস্র দরিদ্রের মধ্য হইতে এক একজন করিয়া ভিক্ষার্থীদিগকে দেবীর সিংহাসনসমীপে রঙ্গরাজ আনিতে লাগিল। তাহারা সম্মুখে আসিয়া ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। যে বয়োজ্যেষ্ঠ ও ব্রাহ্মণ সেও প্রণাম করিল - কেননা, অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, দেবী ভগবতীর অংশ, লোকের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণা। সেই জন্য কেহ কখনও তাঁর সন্ধান ইংরেজের নিকট বলিত না, অথবা তাহার গ্রেপ্তারির সহায়তা করিত না। দেবী সকলকে মধুর

ভাষায় সম্বোধন করিয়া তাহাদের নিজ নিজ অবস্থার পরিচয় লইলেন। পরিচয় লইয়া যাহার যেমন অবস্থা তাহাকে সেইরূপ দান করিতে লাগিলেন।'[৯]

জলপাইগুড়ি শহরের উপকণ্ঠে এখনো দেবী চৌধুরাণীর সেই স্থান রয়েছে। জঙ্গল নেই, কিন্তু মন্দির আছে।

এই বৈকণ্ঠপুরের জঙ্গলে ইংরেজের সঙ্গে সন্ন্যাসী সেনাদের লড়াইয়ের বর্ণনাও আমরা পাই ঃ

'পিপীলিকাশ্রেণীবৎ বরকন্দাজের দল ত্রিস্রোতার তীর-বন সকল হইতে বাহির হইতে লাগিল। মাথায় লাল পাগড়ি, মালকোঁচামারা, খালি পা - জলে লড়াই করিতে হইবে বলিয়া কেহ জুতা আনে নাই। সবার হাতে ঢালসড়কি - কাহারও কাহারও বন্দুক আছে - কিন্তু বন্দুকের ভাগ অল্প। সকলেরই পিঠে লাঠি বাঁধা - এই বাঙ্গালার জাতীয় হাতিয়ার। বাঙ্গালী ইহার প্রকৃত ব্যবহার জানিত; লাঠি ছাড়িয়াই বাঙ্গালী নির্জীব হইয়াছে।

'বরকন্দাজেরা দেখিল, ছিপগুলি প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে - বজরা ঘেরিবে। বরকন্দাজ দৌড়াইল - 'রাণীজি কি জয়' বলিয়া তাহারাও বজরা ঘেরিতে চলিল। তাহারা আসিয়া আগে বজরা ঘেরিল - ছিপ তাহাদের ঘেরিল। আর যে সময়ে শাঁক বাজিল ঠিক সেই সময়ে জন কত বরকন্দাজ আসিয়া বজরার উপর উঠিল। তাহারা বজরার মাঝি-মাল্লা - নৌকার কাজ করে, আবশ্যক মতো লাঠি-সড়কিওচালায়। তাহারা আপাততঃ লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হইবার কোন ইচ্ছা দেখাইল না। দাঁড়ে হালে, পালের রসি ধরিয়া, লগি ধরিয়া, যাহার যে স্থান, সেইখানে বসিল। আরও অনেক বরকন্দাজ বজরায় উঠিল। তিন চারি শ বরকন্দাজ তীরে রহিল - সেইখান হইতে ছিপের উপর সড়কি চালাইতে লাগিল। কতক সিপাহী ছিপ হইতে নামিয়া, বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া তাহাদের আক্রমণ করিল। যে বরকন্দাজেরা বজরা ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অবশিষ্ট সিপাহীরা তাহাদের উপর পড়িল। সর্বত্র হাতাহাতি লড়াই হইতে লাগিল। তখন মারামারি, কাটাকাটি, চেঁচামেচি, বন্দুকের হুড়মুড়, লাঠির ঠক্‌ঠকি, ভারি হুলুস্থুল পড়িয়া গেল; কেহ কাহারও কথা শুনিতে পায় না - কেহ কোন স্থানে স্থির হইতে পারে না।'[১০]

বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল নিয়ে কতকাল আগে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন। পরবর্তীতে অনেক কথাকারের উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের বন নদীর কথা এসেছে। মানুষের কথা এসেছে। যে যাঁর নিজের ভঙ্গীতে লিখেছেন। কখনও প্রকৃতি প্রাধান্য পেয়েছে। কখনও মানুষ। কখনও আবার দুইই মিলেমিশে একাকার।

উত্তরবঙ্গ নিয়ে যাঁরা উপন্যাস লিখেছেন তাঁদের মধ্যে প্রধান ঔপন্যাসিক হলেন অমিয়ভূষণ মজুমদার, দেবেশ রায় ও সমরেশ মজুমদার। সেইসঙ্গে উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী কথাকারদের উপন্যাসেও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় উত্তরবঙ্গ উঠে এসেছে। এই গবেষণা প্রকল্পে তা নিয়ে চর্চা করা হবে।

উল্লেখপঞ্জী

১) উত্তরের ডায়েরি/অমিত কুমার দে/দেশ পত্রিকা/১৭.০২.২০১২

২) জনগণনা রিপোর্ট-২০০১

৩) উত্তরবাংলার জীবন ও সংস্কৃতি/সম্পাদনা ঃ শেখ মকবুল ইসলাম/ পৃ-৩৭-৪২

৪) তদেব/পৃ-৪৪

৫) বঙ্কিম রচনাবলী/তুলিকলম, কলকাতা-৯/প্রথম সংস্করণ-১৯৮৬/ পৃ-৬৬৯

৬) প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ/সম্পাদনা ঃ ড. আনন্দগোপাল ঘোষ ও ড. নীলাংশুশেখর দাস/সংবেদন, মালদা/প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি-২০১১/পৃ-১৮২

৭) বঙ্কিম রচনাবলী/তুলিকলম, কলকাতা-৯/প্রথম সংস্করণ-১৯৮৬/ পৃ-৭৭৭

৮) তদেব/পৃ-৭৯৪

৯) তদেব/পৃ-৭৯৫

১০) তদেব/পৃ-৮০৭